কালের কন্ঠ, ২৮ আগস্ট ২০১২, শ্রেণীসংখ্যা- ০৭০.৪০৮

২৮.০৮.২০১২

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

নকল ওষুধ : নৃশংস হত্যাকারী

ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রয়ে বেশি উৎসাহী হয়। এ ফর্মুলা ওষুধ কম্পানিগুলোর ক্ষতির পরিমাণ বাড়ায়। বাংলাদেশে সম্প্রতি অসংখ্য ওষুধের দাম দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সুযোগটা দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই

আসল ওষুধের নামে ও অবয়বে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলকভাবে নকল উপকরণ বা ভেজাল দিয়ে উৎপাদিত ওষুধকে নকল ওষুধ বলে। ব্র্যান্ডের ওষুধের মতো জেনেরিক ওষুধও নকল হয়। অনেক ওষুধে ঠিক উপকরণটি ব্যবহার করা হলেও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। এসব ওষুধকে নিম্নমানের ওষুধ বলা হয়। নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ রোগীর জন্য কেন বিপজ্জনক তা খানিকটা বর্ণনা করা যাক। ওষুধ উদ্ভাবনের সময় দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকরা নির্ধারণ করেন, কোন ওষুধে রোগ সারানোর জন্য কী পরিমাণে সক্রিয় উপাদান থাকতে হবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেটে সক্রিয় উপাদান হিসেবে প্যারাসিটামল থাকে ৫০০ মিগ্রা। সক্রিয় উপাদানের সঙ্গে আয়তন বাড়ানোর জন্য স্টার্চ, ল্যাকটোজ বা অন্যান্য নিষ্ক্রিয় উপাদান যোগ করাসহ ট্যাবলেটের আকার-আকৃতি দেওয়ার জন্য অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে ওষুধের পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া হয়। অনেক সময় সক্রিয় উপাদানের পরিমাণ এত কম থাকে যে (যেমন ১ মিগ্রা) তা দিয়ে ওষুধের আকার-আকৃতি দেওয়া যায় না। তাই নিষ্ক্রিয় উপকরণ মিশিয়ে আয়তন বাড়িয়ে ওষুধ তৈরি করা হয়। ওষুধে সক্রিয় উপাদান না থাকলে তাকে ওষুধ বলা যাবে না। প্যারাসিটামল ব্যবহার না করেই শুধু স্টার্চ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে এমন ট্যাবলেট তৈরি করা যায়, যা দেখলে মনে হবে হুবহু একটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। সক্রিয় উপাদান না থাকার কারণে এমন ওষুধ খেলে ব্যথা-বেদনা বা জ্বর সারবে না। তাই এসব ওষুধকে বলা হয় নকল ওষুধ। সামান্য ব্যথা-বেদনা বা জ্বর সারানোর জন্য নকল প্যারাসিটামল ব্যবহারের কারণে রোগ না সারলেও তা আপনার জীবনের জন্য বিপজ্জনক না-ও হতে পারে, যদিও তা অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। কিন্তু এমন সব রোগ আছে, যে ক্ষেত্রে আপনি ওষুধ সঠিকমাত্রায় সেবন না করলে রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে এবং একসময় রোগী মারাও যেতে পারে। সংক্রামক রোগের কথাই ধরা যাক। সংক্রামক রোগের প্রতিকারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার অপরিহার্য। জীবাণু দ্বারা শরীর বা শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীর ও জীবাণুর মধ্যে টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শরীর তার প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য জীবাণু ধ্বংস করার কাজ চালিয়ে যায়। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল বা নষ্ট হয়ে গেলে এবং কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক সেবন না করা হলে জীবাণু শরীর ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এর অর্থ হলো স্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং পরে অবধারিত মৃত্যু। নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করে কার্যকারিতা না পেয়ে চিকিৎসক বা রোগী একের পর এক অ্যান্টিবায়োটিক পরিবর্তন করাতে থাকে। এভাবে নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে জীবাণু ওষুধের কার্যকারিতাকে নিষ্ফল করে দিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে শরীরে বহাল তবিয়তে টিকে থাকতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট বর্তমান বিশ্বের ভয়ানক বিপদগুলোর মধ্যে অন্যতম বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্যদিকে বেশি পরিমাণে সক্রিয়

অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে রোগী মারাও যেতে পারে। সম্প্রতি ল্যানসেট প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে জানা যায় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ ম্যালেরিয়ার ওষুধ নকল। গবেষকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাতটি দেশে পাঁচ ধরনের এক হাজার ৪৩৭টি ম্যালেরিয়ার ওষুধের নমুনা পরীক্ষা করে দেখতে পান, এসব ওষুধের ৩৬ শতাংশ নকল। এসব নমুনার মধ্যে ৩০ শতাংশ ওষুধে কোনো উপকরণই (অ্যাকটিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট) নেই। সাব সাহারা অঞ্চলের ২১টি দেশে ছয় প্রকারের আড়াই হাজার ওষুধের মধ্যে ২০ শতাংশ ওষুধ জাল এবং ৩০ শতাংশ ওষুধ নিম্নমানের বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ২০১০ সালে সারা বিশ্বে ম্যালেরিয়ায় ছয় লাখ ৫৫ হাজার মানুষ মারা যায়। নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ এসব মৃত্যুর জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী বলে মনে করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এসব নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধের মধ্যে বেশির ভাগ হলো আর্টেমিসিনিন ও আর্টেমিসিনিন থেকে রাসায়নিকভাবে উদ্ভাবিত অন্যান্য ওষুধ। আর্টেমিসিনিন গ্রুপের ওষুধগুলো এখন পর্যন্ত ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর ও অগ্রগামী ওষুধ বলে বিবেচিত হয়। কারণ ম্যালেরিয়ার অন্যান্য ওষুধের বিরুদ্ধে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট ইতিমধ্যে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই আতঙ্কজনক সমস্যার কারণ মূলত বহুবিধ। আত্মচিকিৎসার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিকারে ওষুধের নির্বিচার অপব্যবহার, ম্যালেরিয়ার ওষুধের যথাযথ গুণগতমান নিশ্চিতকরণে ব্যর্থতা এবং অসাধু নকলবাজ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানে অনীহা ও ব্যর্থতা উল্লিখিত সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গত দশকে ম্যালেরিয়া নির্মূলে যে অভাবনীয় বিনিয়োগ ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ম্যালেরিয়ার ওষুধের কারণে তা ভেস্তে যেতে বসেছে। সিয়াটলে ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের 'দ্য ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন' গত মাসে এক রিপোর্টে জানায়, আর্টেমিসিনিন রেজিস্ট্যান্ট ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট প্রথমে ২০০৬ সালে কম্বোডিয়ায় চিহ্নিত করা হয়েছিল। তখন থেকে ম্যালেরিয়া রেজিস্ট্যান্ট প্যারাসাইট থাইল্যান্ড-মিয়ানমার বর্ডার পর্যন্ত ৮০০ কিলোমিটার বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপকে 'সাইলেন্ট কিলার' বা নীরব ঘাতক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর লাখ লাখ লোক উচ্চ রক্তচাপে মৃত্যুবরণ করে। উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুটি মরণঘাতী রোগ হলো হৃদরোগ ও স্ট্রোক। হৃদরোগ ও স্ট্রোকে আক্রান্ত মানুষ অকর্মণ্য হয়ে যায় বা মৃত্যুবরণ করে। প্রাকৃতিক উপায়ে অথবা লাইফস্টাইল পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হলে রোগীকে ওষুধ গ্রহণ করতে হয়। ওষুধ যদি আসল ও গুণগত মানসম্পন্ন হয় তবে রোগী ওষুধ সেবন করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে। আর ওষুধ যদি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের হয় তবে রোগীর কী অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখুন।

পরিসংখ্যান মোতাবেক, বিশ্বের ১৫ শতাংশ ওষুধ নকল। এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে নকল ওষুধের পরিমাণ ৫০ শতাংশ। অ্যাঙ্গোলায় নকল ওষুধের পরিমাণ মোট ওষুধের ৭০ শতাংশ। ২০০৫ সালে ওইসিডির (অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) হিসাব মতে, সারা বিশ্বে নকল ওষুধের বিক্রির পরিমাণ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার। নকল ওষুধ উৎপাদনে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলো হলো পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, ল্যাতিন আমেরিকা, পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের বেশকিছু দেশ, আফ্রিকা এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। ওসব দেশে বেশি নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদিত হয় যেসব দেশে ওষুধ শিল্পে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত শিথিল এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার অভাব রয়েছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার ও নীতিনির্ধারকদের দুর্নীতির কারণে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ ও পণ্যের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, নিউজিল্যান্ড, পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধের পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম। কারণ ওসব দেশে ওষুধ ও ওষুধ শিল্পের ওপর সরকারের কঠোর আইন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত আছে। চীনে ওষুধ ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল ও নকলের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। ওষুধের অনলাইন বেচাকেনা বিশ্বজুড়ে নকল ওষুধের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করেছে। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব বোর্ড অব ফার্মেসির মতে, ৯ হাজার ৬০০ অনলাইন ফার্মেসির মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ কম্পানি গুণগত মানের শর্ত পূর্ণ করে। ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে ইউরোপীয় ট্রেড কমিশন অ্যান্টি-কাউন্টারফিটিং ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (নকলবিরোধী বাণিজ্য চুক্তি) সম্পাদনের কাজ সম্পন্ন করেছে। চুক্তিতে পেটেন্ট রুল সংরক্ষণ, নকল ওষুধ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই সমস্যা সমাধানে বৃহত্তর সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করার বিধান রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া, মেক্সিকো, মরক্কো, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি সম্পাদনে অংশগ্রহণ করে। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নকল ওষুধের দৌরাত্ম্য বহুলাংশে কমে যাবে। তবে নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ প্রতিরোধ এত সহজ হবে না, বিশেষ করে অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোতে। কারণ এসব দেশে মাথাপিছু আয় নগণ্য হওয়ার কারণে দামি ওষুধ কেনার সামর্থ্য না থাকায় মানুষ সস্তায় ওষুধ পেতে চাইবে। ওষুধের দাম বেশি হলে অসাধু ব্যবসায়ীরা নকল ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রয়ে বেশি উৎসাহী হয়। এ ফর্মুলা ওষুধ কম্পানিগুলোর ক্ষতির পরিমাণ বাড়ায়। বাংলাদেশে সম্প্রতি অসংখ্য ওষুধের দাম দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সুযোগটা দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নয়নের ফলে আজকাল আসল আর নকল ওষুধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শুধু জানা যায় কোনটা আসল আর কোনটা নকল ওষুধ। এর পরও কিছু চিহ্ন তার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নকল ওষুধ চেনা যায়। নকল ওষুধের অদ্ভুত ধরনের গন্ধ, স্বাদ ও রং থাকে। নকল ওষুধ অতি সহজে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় বা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ওষুধের প্যাকেটের গুণগত মান তেমন ভালো হয় না। লেবেলে নির্দেশনায় ভুল বানানের শব্দ থাকে এবং নির্দেশনায়ও ভুল থাকতে পারে। নকল ওষুধের দাম অত্যন্ত কম হয়। আসল ওষুধের দামের সঙ্গে তুলনা করলে একই নকল ওষুধের দামের তারতম্য ওষুধের গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কিছু উপায় আছে। উপায়গুলো অবলম্বন করলে নকল ও ভেজাল ওষুধের দৌরাত্ম্য থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

এক. আপনার পরিচিত দোকান থেকে ওষুধ কিনুন, যে দোকান বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

দুই. অনলাইনে ওষুধ কেনা থেকে সাবধান হোন। অনলাইনে ওষুধ কিনতে চাইলে ভেরিফাইড ইন্টারনেট ফার্মেসি প্র্যাকটিস সাইট (VIPPS) সিলযুক্ত ওয়েবসাইট দেখে কিনুন। অনলাইন ফার্মেসিগুলো বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হলে ওগুলো থেকে ওষুধ কিনবেন না। অনেক ফার্মেসির VIPPS রয়েছে।

তিন. ওষুধ কেনার পর ওষুধের প্যাকেট ভালো করে পরীক্ষা করুন। নকল ওষুধ হলে প্যাকেটে কোনো না কোনো ভুল বা ত্রুটি ধরা পড়বে। প্যাকেটের ভেতর যে লিফলেট রয়েছে তা-ও ভালো করে পড়ে দেখুন। সেখানেও অসংখ্য ভুল থাকতে পারে। ওষুধটি ভালো করে পরীক্ষা করুন। আসল ও নকল ওষুধের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। সন্দেহ হলে ওই দোকান থেকে ওষুধ কিনবেন না।

চার. বিদেশ ভ্রমণকালে আপনার সব ওষুধ সঙ্গে নিন। পথে-ঘাটে ওষুধ কিনবেন না। অচেনা-অজানা জায়গায় ও দোকানে ওষুধ কিনলে তা নকল হতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাবি এবং উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

East West University LIBRARY 43, Mohakhali C/A